পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ ইসলাম ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ১৩শ সংখ্যা

২৯শে কার্তিক ১৩৮২ বাংলা : ১৫ই নভেম্বর ১৯৭৫ ইং : ৯ই যিলকা'দা ১৩৯৫ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

২৯শ বর্ষ
১৩ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ আল-কুরআন : সুরা ফাতেহার তফসীর	মুল : হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ	১
০ হাদিস শরীফ : কয়কটি দোওয়া	অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১০
০ অমৃতবাণী : প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর সত্যতার নিদর্শনাবলী	হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : খন্দকার ছালাহ উদ্দীন আহমদ	১১
০ কতিপয় এলহাম ও রো'ইয়া		১৪
০ জুমার খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৫

বাঃ জামাত আহ্‌মদীয়ার ৫৩ তম সালানা জলসা

আগামী ৫, ৬ ও ৭ই মার্চ ১৯৭৬ইং তারিখে বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় সালানা জলসা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইবে। ইন্‌শা আল্লাহ।

بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ১৩ম সংখ্যা

২৯ কার্তিক, ১৩৮২ বাং : ১৫ই নভেম্বর, ১৯৭৫ ইং : ১৫ই নবুয়ত ১৩৫৪ হিজরী শামসী

আল-কুরআন

সুরা ফাতেহার তফসীর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) প্রণীত 'তফসীরে কবীরের' অবলম্বনে লিখিত]

—মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

(আমি) আল্লাহ্‌র নাম লইয়া (আরম্ভ করিতেছি), যিনি অনন্ত প্রদাতা, বার বার করুণাকারী। *

(আঃ)-এর সঙ্গে তাঁহার মুখ নিঃসৃত আল্লাহ্‌র কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া যাইবার জন্য স্বয়ং আল্লাহ্‌ কর্তৃক আয়াতের প্রথমেই 'পড়' শব্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরেকে 'পড়' শব্দে এই গ্রন্থ সদা পড়িবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ইহার নাম রাখা হইয়াছে আল-কুরআন অর্থাৎ পাঠ্য। উল্লিখিত আয়াতের মর্মের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এই সুরা এবং প্রত্যেক সুরা আল্লাহর তিন গভীর অর্থবোধক নাম লইয়া অর্থাৎ بسم الله الرحمن الرحيم দ্বারা আরম্ভ করা হইয়াছে। اسم শব্দের অর্থ নাম, নিদর্শন, লক্ষণ

---

* শব্দার্থ :— بسم শব্দ با এবং اسم এই দুই শব্দের সংযোগে গঠিত। با শব্দের অর্থ 'সহিত বা লইয়া'। কুরআনের প্রথম নযুলের সময় اقرأ باسم ربك الذى خلق আয়াত নাযেল হয়। ইহার অর্থ "পড় তোমার রবের নাম লইয়া, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন"। যেহেতু হযরত রসুল করীম (সাঃ) জীবরাইল (আঃ)-কে বলিয়াছিলেন যে, তিনি পড়িতে জানেন না, সেই জন্য জীবরাইল

অথবা উচ্চ হওয়া। اللّٰه সেই পবিত্র অস্তিত্বের নাম, যিনি অনাদি ও অনন্ত, চিরঞ্জীব ও জীবনদাতা এবং চিরস্থায়ী ও স্থিতিদাতা এবং বিশ্ব চরাচরের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। আল্লাহ্ যেরূপ এক ও অদ্বিতীয়, اللّٰه শব্দটিও তেমনি আরবী ভাষায় এক ও অদ্বিতীয়। ইহা কোন শব্দ হইতে উদ্ভূত নহে এবং ইহা হইতেও কোন শব্দ উদ্ভূত হয় নাই। ইহা কোন গুণবাচক বা বর্ণনা-বাচক শব্দ নহে। ইহার বহুবচন নাই। ইহা সেই পবিত্র স্বত্তার জাতীয় নাম। অন্য কোন ভাষায় ইহার তুল্য কোন শব্দ নাই। অপর সকল ধর্মে ও ভাষায় আল্লাহ্র গুণ বা বর্ণনাবাচক নাম আছে এবং ঐ সকল নামের বহুবচনও আছে এবং স্ত্রী-লিঙ্গও আছে। الرحمٰن শব্দ رحم শব্দ হইতে فعلان রূপের ওজনে উদ্ভূত। ইহার অর্থ ব্যাপক করুণার মালিক, যিনি স্বীয় অযাচিত করুণার দ্বারা বিশ্ব চরাচরের সব কিছু এবং প্রত্যেককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন এবং যিনি হক ছাড়া এবং জীবন ও কর্মের পূর্বেই অযাচিত ও ব্যাপক করুণার দানে ভূষিত করেন। এই গুণের প্রকাশে তিনি জীবনধারী সকল জীবের দৈহিক জীবনধারণের সকল উপকরণের ব্যবস্থা জন্মের পূর্বেই করিয়াছেন এবং মানব জাতির জন্য দৈহিক ছাড়াও আধ্যাত্মিক জরুরত পুরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালার এই নামের প্রকাশ মানবের জন্য বিশেষভাবে এই জগতে নির্ধারিত হইয়াছে।

الرحيم শব্দও رحم শব্দ হইতে فعيل রূপের ওজনে উদ্ভূত। ইহার অর্থ কর্মের ফল স্বরূপ হক হিসাবে পূণ্যশীলকে বার বার পুরস্কার দিয়া যাইতে থাকা। এই পুরস্কারের স্বরূপ ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তের আকারে অনন্তে বিস্তৃত। যেমন একটি আমের গাছ ল'গাইলে উহা হইতে লক্ষ লক্ষ ফল পাওয়া যাইতে থাকে এবং ঐ সব ফলের আঁটি হইতে অসংখ্য গাছ ও ফলের উদ্ভব হইতে থাকে। আল্লাহ্তায়ালার এই গুণের প্রকাশ মানবের জন্য বিশেষভাবে পরলোকে হইবে। আল্লাহ্তায়ালার الرحيم গুণের সম্বন্ধ বিশেষভাবে মোমেনগণের শুভ কর্মফলের সহিত এবং পরকালে ইহার প্রকাশের সহিত সংশ্লিষ্ট। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন وكان بالمؤمنين رحيما—

"এবং তিনি মোমেনদের প্রতি বার বার করুণাকারী।" (সুরা আহযাব, ৬ষ্ঠ রুকু)। পরলোকে মোমেনদের জন্য জান্নাতের সৃষ্টি এই গুণেরই প্রকাশক। কিন্তু কর্মের পূর্বের দানের জন্য তিনি الرحمٰن যেমন তিনি বলিয়াছেন— الرحمٰن علم القرآن "আর-রহমান কুরআন শিখাইয়াছেন।" (সুরা আর-রহমান, ১ম রুকু)। কুরআন মজিদ সমগ্র মানবজাতির জন্য বিনা সুকর্মে অযাচিত আধ্যাত্মিক মহা দান।

সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালার الرحمن রূপে আমাদিগের জন্ম ও কর্মের পূর্বেই আমাদিগের জীবন যাত্রা এবং জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অনন্ত অযাচিত দানের সম্ভারে ইহজগতকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন।

কবির ভাষায়,

"না চাইতে তুমি যা করেছ দান আকাশ
আলোক তনু মন প্রাণ
দিনে দিনে তুমি সে মহাদানেরই নিতেছ
আমায় যোগ্য করে—"

তাঁহার الرحيم গুণ মোমেনগণের সুকর্মের নিত্য ও বর্ধায়মান প্রতিদান কল্পে পরলোকে তাহাদিগের জন্য অনন্ত সম্প্রসারণশীল আনন্দ সম্ভারে ভূষিত করিয়া যাইতে থাকিবেন। الرحمن-এর গুণ আমাদিগকে বিনা হকে ইহজগতে অনন্ত বিস্তৃত অযাচিত দানে ভূষিত করিয়াছেন এবং الرحيم গুণ পরলোকে সুকর্মের ফলে আমাদিগকে অনন্ত সম্প্রসারণশীল দানে ভূষিত করিবেন। الرحمن শব্দ অযাচিত ও বহু ব্যাপক দান নির্দেশক এবং الرحيم বদান্যতার সহিত বার বার কর্মের পুরস্কার নির্দেশক। الرحمن শব্দ আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হয় এবং الرحيم শব্দ মানুষের দানের জন্যও ব্যবহৃত হয়। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন,

الرحمن رحمن الدنيا و الرحيم رحيم الاخرة ۔

আর-রহমান, সাধারণত, এই দুনিয়ার সম্পর্কিত এবং আর-রহীম পরলোক সম্পর্কিত।

ব্যাখ্যা

সুরা বরায়ত (আত-তৌবা) ছাড়া পবিত্র কুর-আনের ১১৪টি সুরার প্রত্যেক সুরার প্রথম আয়াত ইহা। সুরা বরায়ত অবশ্য, পৃথক সুরা নহে, বরং সুরা আনফালের পরিশিষ্ট। সেই জন্য উহার প্রথমে بسم الله الرحمن الرحيم আয়াত সন্নিবেশীত হয় নাই। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, প্রথমে বিসমিল্লাহ্‌ আয়াত ছাড়া কোন সুরার নযুল তিনি জানেন না। (আবু দাউদ)। সুতরাং বিসমিল্লাহ্‌ আয়াত প্রত্যেক সুরার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুরা নহলের মধ্যে বিসমিল্লাহ আয়াত প্রথমে ছাড়াও মধ্যে আর একবার মজমুনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে আসিয়াছে, যেখানে সাবার রাণীকে হযরত সোলেমান (আঃ) যে পত্র লিখিয়াছিলেন উহাতে এই আয়াত দ্বারা আরম্ভ করার উল্লেখ আছে। ফলে কুরআন মজিদে বিসমিল্লাহ আয়াত ১১৪ বার আসিয়াছে।

এই তফসীরের প্রথমেই উল্লেখিত হইয়াছে যে, কুরআন মজিদ পাঠ আরম্ভ করিবার পুর্বে আউয পড়িতে হয়। পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, যখনই কুরআন মজিদ পড়িতে আরম্ভ করিবেন তখন আউয পড়িয়া লইবেন। কিন্তু যেখান হইতে পড়িবেন, সেখানে বিসমিল্লাহ না থাকিলে শুধু আউয পড়িবেন এবং যেখানে

বিসমিল্লাহ আছে সেখানে আউযের পর বিসমিল্লাহ পড়িবেন। নচেৎ নহে।

বিসমিল্লাহর ফযিলত

(১) হযরত রসুল করীম (সা:) বিসমিল্লাহ্ আয়াতের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বিসমিল্লাহ্ ছাড়া কোন কাজ আরম্ভ করিলে উহা বেবরকত হয়। সেই জন্য মুসলমানগণ প্রত্যেক কার্য আরম্ভ করিবার সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করে। এই আয়াতের মধ্যে এক মহান দোওয়া নিহিত আছে। সেই দোওয়া হইল, "হে আল্লাহ্। আমি তোমার নাম লইয়া এই কার্য আরম্ভ করিতেছি। তোমার الرحمن (আর-রহ্মান) নামের নিকট আমি আবেদন করিতেছি যে তুমি তোমার অযাচিত দানের গুণে আমার হস্তে ন্যাস্ত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ দাও এবং উহার সদ্ব্যবহারের ফলে তোমার الرحيم (আর-রহীম) গুণে আমাকে আমার সুকার্যের ফল বদান্য হস্তে দান কর এবং বার বার দান কর।" পূর্ববর্তী নবীগণও আল্লাহ্র নাম লইয়া কাজ আরম্ভ করিতেন। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা সোলেমান (সা:)-এর পত্র লেখার ব্যাপারে উপরে বর্ণনা করিয়াছি। হযরত নূহ (আ:) যখন তুফানের সময়ে কিস্তিতে আরোহণ করেন, তখন তিনি আল্লাহ্র নামায লইয়া আরোহণ করেন এবং সঙ্গীগণকে আদেশ করেন اركبوا فيها بسم الله مجريها و مرسها পাঠ করিয়া কিশ্তিতে আরোহণ কর। "আল্লাহ্র নামে ইহার জল-যাত্রা হউক এবং (যাত্রাশেষে) ইহার নঙ্গর স্থাপনা হউক।" (সুরা হুদ, ৪র্থ রুকু)।

২। পবিত্র কুরআন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের তোষাগার স্বরূপ। আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতিরেকে ইহার মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ সম্ভব নহে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্-তায়ালা বলিয়াছেন لا يمسه الا المطهرون অর্থাৎ ঐ সকল লোক ব্যাতিরেকে, যাহাদিগকে আল্লাহ্ এই কার্যের জন্য পবিত্র ও গ্রহণ করিয়াছেন, অপর কেহ কুরআনের তত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে না। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, يضل به كثيرا و يهدى به كثيرا আল্লাহ্তায়ালা অনেকের জন্য কুরআন করীমকে হেদায়েতের কারণ করেন এবং অনেকের জন্য ইহাকে পথ ভ্রান্তির কারণ করেন। অর্থাৎ উভয়ের জন্য শব্দ ও বাক্যাবলী একই, কিন্তু ফল পৃথক হইয়া থাকে। এখন প্রশ্ন উঠে, মন্দ হইতে বাঁচিয়া ভাল ফল লাভ করিবার জন্য এবং পবিত্র কুরআনের তত্ব বুঝিবার জন্য কোন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ইহার উত্তর উপরেই আউয পড়ার এবং প্রত্যেক সুরার প্রথমেই বিসমিল্লাহ পড়ার নির্দেশের মধ্যে দেওয়া আছে। অর্থাৎ কুরআন করীম পড়ার পূর্বে প্রথমেই শয়তানের আক্রমণ হইতে বাঁচিবার দোওয়া মাগিয়া লও এবং আল্লাহ্-তায়ালাকে তাঁহার রহমান ও রহীমীয়তের দোহাই

দিয়া নিজ লক্ষ্য অর্জন কর এবং ভ্রান্তি হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হইবার হেদায়েত লাভ কর।

৩। তওরাত গ্রন্থে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল যে, বনি ইসমাইল বংশে মুসা (আঃ)-এর অনুরূপ এক নবীর আবির্ভাব হইবে। তাঁহার সম্বন্ধে এই আদেশ "আমার নাম লইয়া সে আমার যে সকল বাণী শুনাইবে, সেই সকল যাহারা শুনিবে না, আমি তাহাদিগের নিকট হিসাব গ্রহণ করিব।" (তওরাত—১৮ অধ্যায় ১৯ আয়াত)। এতদ্বারা প্রতিশ্রুত নবীর জন্য ইহাই নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল যে, তিনি যখনই আল্লাহ্‌র বাণী শুনাইবেন, তখনই তিনি আল্লাহ্‌র নাম লইয়া শুনাইবেন, নিজ পক্ষ হইতে নহে। সুতরাং এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইহা জরুরী ছিল যে, পবিত্র কুরআনের প্রত্যেক সুরার প্রথমে বিসমিল্লাহ থাকিবে। এতদ্বারা একদিকে মুসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল এবং খ্রীষ্টানগণের জন্য নিত্য সতর্কবাণীর কাজ করিবে। তাহারা এই ঐশীবাণীর প্রতি কর্ণপাত না করিলে মুসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার শাস্তিতে নিপতিত হইবে।

৪। তওরাত গ্রন্থে লিখিত আছে, "কিন্তু যে নবী আমার নামে এমন কথা বলিতে সাহস করিবে, যাহা আমি তাহাকে বলিতে আদেশ করি নাই, অথবা অন্য দেবতার নাম লইয়া বলিবে, সেই নবী নিহত হইবে।" (তৌরাত ১৮ : ২০)। এই আয়াতে সতর্ক করা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার নাম লইয়া মিথ্যা কথা বলিবে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে ধ্বংস করিবেন। এই আয়াতে সতর্কবাণীমূলক বিধানকে সম্মুখে রাখিয়া কুরআন করীমের প্রত্যেক সুরার গোড়ায় বিসমিল্লাহ রাখা হইয়াছে, যাহাতে খাসভাবে ইহুদী ও খ্রীষ্টান এবং সাধারণভাবে বাকি জগতবাসীর জন্য ইহা অকাট্য দলীল হয় এবং উক্ত সতর্কবাণীর বর্তমানতায় হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সাফল্য এবং উন্নতি দেখিয়া প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি নিশ্চিত ভাবে বুঝিতে পারে যে, তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, সব খোদার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছেন। তাহা না হইলে তিনি যখন খোদাতায়ালার নাম লইয়া সকল কথা বলিলেন, তখন তিনি (নউযুবিল্লাহ) ধ্বংস হইলেন না কেন? সুতরাং 'বিসমিল্লাহ' ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণের বিরুদ্ধে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সত্যতার অকাট্য দলীল। প্রত্যেক সুরার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ রাখিয়া তাহাদিগকে ১১৪ বার অপরাধী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু যদি কুরআন করীমের গোড়ায় একবার মাত্র বিস্‌মিল্লাহ্‌ আয়াত রাখা হইত, তাহা হইলে কুরআন করীমের সত্যতার দলীল এরূপ অব্যর্থ হইত না।

(৫) কুরআন করীমের গোড়ায় বিস্‌মিল্লাহ্‌ আয়াত রাখার উদ্দেশ্য এই যে কুরআন

করীমের পাঠক তিন প্রকারের হইতে পারে। (ক) রিক্তহস্ত ও স্বম্বলহীন, (খ) পাপে নিমজ্জিত হইয়া খোদাতায়ালার বিরাগ ভাজন হইয়াছে এবং তাঁহার ফযলকে আকর্ষণ করার কোন স্বাভাবিক উপায় নাই, এবং (গ) ধর্ম-কর্মশীল হইতে পারে। এই তিন প্রকার মানুষের মানসিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হইবে। প্রথম ব্যক্তি হয়রান, দ্বিতীয় নিরাশ এবং তৃতীয় ব্যক্তি অহঙ্কারে উদ্দীপ্ত। প্রথম ব্যক্তি হয়রান এই ভাবিয়া যে, সে কোথায় সত্যের সন্ধান পাইবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি নিরাশ এই ভাবিয়া যে, কোন মুখে সে খোদার নিকট ক্ষমা চাহিবে। তৃতীয় ব্যক্তি অহঙ্কারে উদ্দীপ্ত এই জন্য যে, স্বীয় ধর্মকর্মের গরিমায় সে ভাবে যে, যাহা কিছু অর্জন করার ছিল, তাহা সে অর্জন করিয়া লইয়াছে। এই তিন প্রকারের চিন্তার প্রভাবে মানুষ কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। সুতরাং কুরআন করীমের প্রত্যেক সুরার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ্ রাখিয়া রিক্ত হস্ত ও সহায়হীন ব্যক্তিকে পথ দেখান হইয়াছে যে, সম্বলহীন ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার জন্য এক খোদা নিত্য প্রস্তুত রহিয়াছেন, যিনি বান্দাকে অযাচিত দানে ভূষিত করেন। যে ব্যক্তি নাফরমানী করিয়া ক্ষমার হক হারাইয়াছে ভাবিয়া নিরাশ হইয়াছে, তাহাকে এই মন্ত্র বুকভারা সুনিশ্চিত আশা দিয়াছে যে, যে খোদা এই সুরা নাযেল করিয়াছেন, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, বান্দার যত বড় এবং যত অপরাধই হউক, ক্ষমা প্রার্থনা-কারীকে তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিতে তিনি সদা প্রস্তুত। যে ব্যক্তি ধর্ম কর্মের আত্ম-চেতনায় অহঙ্কারী হইয়াছে, তাহাকে এই মন্ত্র সবক দিতেছে যে, খোদাতায়ালার রহমতের ভাণ্ডার অসীম, কোন এক মঞ্জিলে পা রাখিয়া ভাবিওনা যে, যাত্রা শেষ করিয়া ফেলিয়াছ, বরং তোমার সম্মুখে সীমাহীন উন্নতির পথ সম্প্রসারিত। পাঠক এখন উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, এই প্রকারে পথ-ভ্রান্তগণের জন্য ভ্রান্ত ধারণার সংশোধনের পর কুরআন করীমের তত্ত্ব সমূহ যে ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হইবে, তাহা অন্য কোন প্রকারে সম্ভব নহে। সুতরাং প্রত্যেক সুরার গোড়ায় বিস-মিল্লাহ্ আয়াত রাখিয়া সর্বপ্রকার পাপী-তাপী ও পথ-ভ্রান্ত মানবকে কুরআন করীমের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করা হইয়াছে।

(৬) এই আয়াতকে প্রত্যেক সুরার প্রথমে এই জন্য রাখা হইয়াছে যে, ইহা প্রত্যেক সুরার মর্ম উদঘাটন ও উপলব্ধির জন্য চাবী স্বরূপ। আমাদের যাবতীয় জাগতিক ও আধ্যাত্মিক 'প্রয়োজন' উহাদের সমাধানের জন্য আল্লাহ্তায়ালার দুইটি গুণ রহমানীয়ত ও রহী-মীয়তের চারিদিকে সদা ঘূর্ণায়মান। আমাদের জীবনের সকল সমস্যার সমাধানের ও পূরনের জন্য আমরা সদা আল্লাহ্তায়ালার উক্ত দুই গুণের নিকট মুখাপেক্ষী। যেহেতু দুইভাবে ভুল ধারণা জন্মে, যথা কখনও বেশী ব্যাখ্যার দ্বারা এবং কখনও বাক্য সংক্ষেপের জন্য।

সেই জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক সুরার প্রথমে বিস্‌মিল্লাহ্‌ রাখিয়াছেন, যাহাতে কোন স্থানে অর্থ বুঝিতে সন্দেহ হইলে, পাঠক ইহার দ্বারা সন্দেহভঞ্জন করিয়া লইতে পারে। যেখানে সন্দেহ ঠেকিয়াছে, সেখানে অর্থ রহমান ও রহীম গুণের অনুযায়ী হইলে, উহাকে সঠিক বুঝিতে হইবে এবং বিরোধী হইলে, উহাকে ভ্রান্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই ভাবে প্রত্যেক সুরা বিস্‌মিল্লাহ্‌ আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ এবং বিসমিল্লাহ্‌ আয়াত সুরার সঠিক ব্যাখ্যাকারী। এই প্রকারে উভয়ের সাহায্যে পাঠক নির্ভুল অর্থের সন্ধান পাইবে।

বিসমিল্লাহ্‌র উল্লেখ পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীতে

কুরআন করীমের কোন কোন খ্রীষ্টান তফসীরকারক আপত্তি করিয়া থাকে যে, বিসমিল্লাহ্‌ পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলী হইতে নকল করা হইয়াছে। পারস্যদেশের জরথুস্তের গ্রন্থে আছে

بنام خداوند بخشا يند * بخشا ئش گر-

অর্থাৎ "খোদার নামে, যিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।" খ্রীষ্টান তফসীরকারগণ আরও দাবী করে যে, ইহুদীরাও বিসমিল্লাহ্‌র ব্যবহার করিত এবং তাহাদের নিকট হইতে ইহা আরবরা নকল করে এবং তায়েফের আমীর ইহার ব্যবহার প্রচলন করে। কিন্তু খ্রীষ্টান তফসীরকারক রডওয়েল আরবদের মধ্যে এই শব্দের প্রচলনের কথাকে সম্পূর্ণরূপে নাকচ করিয়া দিয়াছে। কারণ আরবরা আর-রহমান্‌ শব্দের বহুল ব্যবহারকে অপছন্দ করিত। যাহা হউক, এই কথার ঐতিহাসিক প্রমাণ থাকা চাই যে, তাহাদের মধ্যে বিসমিল্লাহ্‌র ব্যবহার এই আকারে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এরূপ প্রমাণ কোথাও নাই। পক্ষান্তরে ইহুদীগণের মধ্যে ইহার প্রচলন ছিল বলার অর্থ যদি এই হয় যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আগমনের নিকটবর্তী যুগে ইহুদীগণের মধ্যে ইহার প্রচলন ছিল, তাহা হইলে ইহা ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। তাহাদের মধ্যে ইহার কোন ব্যবহার ছিল না। বাকি থাকিল, সাবার রাণীর নিকট সোলেমান (আঃ)-এর পত্রে এই আয়াতের ব্যবহার। ইহাতে কিছু আসে যায় না। ইসলামের এ দাবী নহে যে, আল্লাহ্‌, রহমান এবং রহীম শব্দত্রয় পূর্বে মানুষের জানা ছিল না। ইসলামের দাবী ইহাই যে, কুরআন করীমে বিসমিল্লাহ আয়াতের যেভাবে সুদৃঢ় উদ্দেশ্য, তরতীব ও প্রয়োগ পদ্ধতিতে ব্যবহার হইয়াছে, উহা ইতিপূর্বে কখনও হয় নাই। সুতরাং জরথুস্তের পুস্তকে যে খোদার নাম লওয়া হইয়াছে, অথবা বিভিন্ন জাতির ধর্ম-পরায়ণ লোকের মধ্যে খোদার নাম লইয়া কাজ করার প্রচলন আছে, কিম্বা সোলেমান (আঃ) সাবার রাণীর নিকট পত্র লিখিতে

বিসমিল্লাহ আয়াতের ব্যবহার করিয়াছিলেন, তদ্বারা কুরআন করীমে অপূর্ব বিন্যাসে বিস্‌মিল্লাহ্ আয়াতের ব্যবহারের মর্যাদাকে কোন দিক দিয়া ক্ষুন্ন করে না। বরং এ সব বিষয় কুরআন করীমের মাহাত্ম্যকে আরও বর্দ্ধিত করে। কুরআনের দাবী, আল্লাহ্‌তায়ালা সকল জাতির মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন (সুরা ফাতের তৃতীয় রুকু) এবং তাঁহারা সকলেই তৌহীদের শিক্ষা দিয়াছিলেন (সুরা আম্বিয়া ২য় রুকু)। অতএব নবী এবং বিভিন্ন জাতির ধর্ম-পরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে আল্লাহ্‌র নাম লইয়া কাজ আরম্ভ করার প্রচলন কুরআন করীমের দাবীর সত্যতাকে সপ্রমাণিত করিতেছে। জরথুস্ত (সাঃ) যে ভাষায় খোদার নাম লইয়াছিলেন, উহা তাঁহার পুস্তকে আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার মন্ত্রে বিস্‌মিল্লাহ্ আয়াতের নিহিত অর্থ, প্রযুক্তি ও তত্বের বিশ অংশের একাংশও নাই। সোলেমান (আঃ) তাঁহার পত্রে বিস্‌মিল্লাহ্ আয়াত ব্যবহার করিয়া থাকিলেও, ইহার সন্ধান বাইবেল, তালমূদ, ইতিহাস বা কিম্বদন্তিতেও নাই। বহু যুগ পরে এ সংবাদ কুরআন করীমে আসিয়াছে। এই সকল বিষয়ই কুরআন করীমের দাবী অনুযায়ী উহাতে যে, সকল যুগের চিরস্থায়ী স্মৃত বা বিস্মৃত শিক্ষা সন্নিবেশীত হইয়াছে, তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। (সুরা বাইয়েনাহ্)। প্রত্যেক কাজ আল্লাহর নাম লইয়া আরম্ভ করার জরুরত যে মানবজীবনে সর্বাগ্রগণ্য, তাহাতে ধর্ম—পরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন দ্বিমত থাকিতে পারে না এবং চির-স্থায়ী শিক্ষার মধ্যে ইহা প্রথম-স্থানীয়। কুরআন করীমই এই শিক্ষাকে যথাযোগ্য এবং কামেল রূপ দান করিয়াছে। এখানে আর একটি কথা স্মরণ রাখার যোগ্য। উহা এই যে কুরআন করীমে শব্দ, বাক্য ও মজমুনের বিন্যাস স্বয়ং আল্লাহ্‌র। ইহার প্রত্যেকটি শব্দ ও বাক্য আল্লাহ্‌র। ইহা সর্বৈব কালামুল্লাহ। অন্য কোন গ্রন্থের এই বৈশিষ্ট নাই। উহাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র বাক্যও আছে এবং মানুষের বাক্যও আছে। ঐগুলি সব কেতাবুল্লাহ নামে অভিহিত। কালামুল্লাহ নহে। উহাদের প্রত্যেকের মধ্যে রদবদল হইয়েছে। কিন্তু একমাত্র কুরআন করীম আজও অবিকৃত, আজও আগাগোড়া কালামুল্লাহ্!

বিস্‌মিল্লাহ্‌র মধ্যে ইসম শব্দ কেন বাড়ান হইয়াছে?

প্রশ্ন হইতে পারে যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য লইয়া কুরআন পাঠ আরম্ভ করিতেছি বলা উচিৎ ছিল। উহার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র নামের সাহায্য লইয়া আরম্ভ করিতেছি কেন বলা হইল? এখানে ইসম অর্থাৎ নাম শব্দ কেন বাড়ান হইয়াছে? ইহার বিস্তারিত উত্তর নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) بَا শব্দের অর্থ সাহায্য ছাড়া কসম খাওয়াকেও বুঝায়। সুতরাং বিল্লাহ্ বলা হইলে সন্দেহ জাগিতে পারিত যে, হয়ত

আল্লাহ্‌র কসম খাইয়া আরম্ভ করিতে বলা হইয়াছে। ইহা অর্থহীন কথা হইত। তাই সন্দেহ ও বিভ্রান্তি দূর করার জন্য ইসম শব্দ বাড়ান হইয়াছে।

(২) আল্লাহতায়ালার সত্তা গুপ্ত। তাঁহার সত্তার তিনি অজ্ঞাত ও চির অজ্ঞেয়। তাঁহার সত্তার পর্যায়ে তাঁহার সঙ্গীও হওয়া যায় না এবং তাঁহাকে মনন ও অনুসরণও করা যায় না। তাঁহার গুণের মাধ্যমে তাঁহার পরিচয় করা যায়। তাঁহার গুণকে মনন ও অনুসরণ করিয়া, তাঁহার আরশিক গুণে ভূষিত হওয়া যায়। কিন্তু কোন সময়েই তাঁহার পূর্ণ গুণের প্রতিবিম্ব হওয়া যায় না। কারণ তাঁহার গুণ অসীম ও অনন্ত। অবশ্য তাঁহার গুণের ক্রমঃ বর্ধিত আকারে প্রতিবিম্ব হওয়া যাইবে। এই জন্য এই আয়াতে আল্লাহ্‌র সহিত না বলিয়া আল্লাহ্‌র নামের সহিত বলা হইয়াছে এবং বিল্লাহ بالله না বলিয়া ইসম শব্দ বাড়াইয়া বিসমিল্লাহ বলা হইয়াছে। আল্লাহ্ তাঁহার সত্তাবাচক মান। ইহা ইসমে আযম বা মহা নাম। কিন্তু যেহেতু এই নামে তাঁহাকে ধারণা, ও মনন করা যায় না, সেই জন্য ইহার সহিত তাঁহার পরিচায়ক গুণ বাচক আর-রহমান এবং আর-রহীম নামদ্বয় সংযুক্ত করা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, হে মহানামধারী আল্লাহ্। আমি তোমার রহমানীয়ত ও রহীমীয়তের অঞ্চল ধরিয়া তোমার নিকট সাহায্য কামনা করিতেছি। আমি তোমার গুণে সঙ্গী হইতেছি।

(৩) এতদ্বারা আমাদের এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার নামের মধ্যে আশিস রহিয়াছে। মানবের কর্তব্য সেদিকে মনোযোগ দেওয়া এবং উহার সাহায্যে সুফল লাভ করা।

(৪) কুরআন করীম এক বন্ধ কোষাগার। যখন কেহ এ রূপ কোন গৃহে প্রবেশ করিতে চাহে, যাহার মধ্যে মালিকের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ, তখন উহার রক্ষক অথবা উহাতে অবস্থানকারীগণকে মালিকের আদেশ বা অনুমতিপত্র দেখাইতে হয়। কিম্বা উহার উল্লেখ করিতে হয়, যেমন কোন পুলিশ কাহারও গৃহে প্রবেশ করিবার কালে বলে, আমি গভর্ণমেণ্টের নামে প্রবেশ করিতেছি এবং অমুক মাল কবজা করিতেছি। ফলতঃ এই ক্ষেত্রে নাম শব্দ বাড়াইয়া এই কথার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি বিস্‌মিল্লাহ্ পড়িয়া কুরআন করীম পড়িতে আরম্ভ করে ; সে যেন কুরআন করীমের খেদমতে মোতায়েন ফেরেস্তাগণকে জানায় যে খোদাতায়ালা স্বয়ং আমাকে এই সুরা পড়িবার আদেশ দিয়াছেন। সুতরাং আমার জন্য ইহার তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দাও। অন্য কথায় বলিতে, সে ইহাই জানায় যে, "আল্লাহ্, রহমান এবং রহীমের নামে এই কোষাগার আমার জন্য উন্মুক্ত করার আবেদন জানাইতেছি।" ইহা হইতে এ কথা সুস্পষ্ট হইবে যে, যে ব্যক্তি এই প্রকারে আন্তরিকতার সহিত কুরআন করীমের প্রতি মনোযোগী হইবে, সে পবিত্র কুরআনের

(১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

হাদিস শরীফ

কয়েকটি দোওয়া

اللهم انى اسئلك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفرلى وترحمنى واذا اردت فتنة فى قوم فتوفنى غير مفتون واسئلك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنى الى حبك -

অর্থাৎ, "হে আমার আল্লাহ্! আমি সকল প্রকারের পুণ্যকার্য সম্পাদনের ও কুকর্ম বর্জনের এবং অনাথ ও অসহায়দিগকে ভালবাসার তওফিক ও সামর্থ্য তোমার নিকট যাচনা করি, এবং ইহাও যে, তুমি আমাকে ক্ষমা কর ও পাপ হইতে রক্ষা কর, এবং আমার প্রতি দয়া ও করুণা বর্ষন কর, এবং যখন তুমি কোন জাতিকে ফেৎনায় গ্রেফতার ও শাস্তিদানের ইচ্ছা কর, তখন আমাকে উহার আওতায় ফেলিওনা বরং আমাকে মৃত্যুদান করিও। আমি তোমার নিকট তোমার ভালবাসা ও তোমার প্রেমিকগণের ভালবাসা এবং সেই সকল কার্যের প্রতি ভালবাসা যাচনা করি, যে কার্যগুলি আমাকে তোমার প্রেম ও ভালবাসার নিকটতর করিয়া দেয়। (তিরমিযী)

(২)

اللهم اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء -

অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ্! পরীক্ষা ও বিপদের নিষ্পেষণ, দুর্ভাগ্যের স্পর্শ ও নিয়তির অকল্যাণ এবং শত্রুর বিদ্রুপ হইতে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি।

(৩)

اللهم انا نجعلك فى نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমরা তোমাকেই আমাদের শত্রুদের মোকাবেলায় ঢাল-স্বরূপ খাড়া করি (বা তোমাকে তাহাদের বক্ষে রাখি, অর্থাৎ তাহাদের হৃদয়ে তুমি ভীতির সঞ্চার কর) এবং তাহাদের ষড়যন্ত্র ও দুষ্কৃতি হইতে আমরা তোমারই আশ্রয় চাই।

(আবু দাউদ)

অনুবাদ: আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

(মূল ঃ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) প্রণীত নাজমুল হুদা নামক আরবী পুস্তক।
অনুবাদ ঃ খন্দকার ছালাহ উদ্দিন আহমদ)

প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর সত্যতার নিদর্শনাবলী

রমযান মাসে সংঘটিত চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের মধ্যে আমার দাবীর সত্যতার আর এক প্রমাণ রহিয়াছে। আমার রচিত "নূরুল হক" নামক পুস্তকে আমি এই ঘটনা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছি। এই নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার বহু পূর্ব হইতেই আমি অবিরাম স্বর্গীয় সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছি। পবিত্র রসুল (সাঃ)-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই নিদর্শন মাহদীর অবির্ভাবের এক সুনিশ্চিত লক্ষণ। সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্-তায়ালার, যিনি আমার উপর তাঁহার অনুগ্রহ-রাশি এত পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষণ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করিয়া তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন। এইরূপে তিনি তাঁহার অন্বেষণ-কারীদের জন্য সুপথ প্রদর্শনের দ্বার উদঘাটন করিয়াছেন এবং এই পথে ভ্রমনের জন্য স্বীয় জ্যোতি প্রদান করেন। এই ঘটনাটির আভ্যন্তরীণ তাৎপর্য বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং হৃদয়ঙ্গম করিতে আকাঙ্খীত এমন সকল লোকের নিকটই এই বিষয় স্পষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাস্তবিকই বলা যাইতে পারে যে, এই স্বর্গীয় নিদর্শনসমূহ বিরুদ্ধবাদীগণকে নিস্তব্ধ করিতে এবং অবিশ্বাসীদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে সদ্য খাপ হইতে বহিষ্কৃত এক উজ্জ্বল তরবারি স্বরূপ। কারণ এমন কতক লোকও আছে, যাহাদের নিকট ক্রুশ মতবাদের বিশেষ আধিপত্য ও এই ধর্মমতের সম্প্রসারণের সময় এবং শতাব্দীর শিরোভাগে আমার আবির্ভাব আমার সত্যতার চূড়ান্ত প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে নাই। তদ্রূপ এমন লোকও আছে, যাহারা এইরূপ মত পোষণ করেন যে, আমার কতক আরবী পুস্তক রচনা ও আরবী সাহিত্যে আমার জ্ঞানের গভীরতা কোন বিশেষ স্বর্গীয় সাহায্যের নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেনা এবং ভাষায় এইরূপ বুৎপত্তি লাভ গোপন প্রচেষ্টার ফলেও সম্ভব-পর হইতে পারে। এইরূপ লোকদের জন্য গ্রহণের নিদর্শনদ্বয় দৃঢ়ভাবে চিন্তা করিবার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। এই ঘটনাদ্বয়ও কি

মানুষের কৌশল উদ্ভাবনের ফলে হওয়া সম্ভব? এই ঘটনাও কি আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে এক সুনিশ্চিত সাক্ষ্য স্বরূপ নহে? সুপ্রসিদ্ধ মুসলিম নেতৃবৃন্দ কর্তৃক হাদীস সমূহে বর্ণিত এই নিদর্শনের বিশেষ বিবরণ এই: "দারকুতনী" ইমাম মোহাম্মদের নিকট শুনিয়া নিম্নোক্ত বিবরণ দেন: "আমাদের মাহদীর আবির্ভাবের পর এমন দুইটি নিদর্শন প্রদর্শিত হইবে, যাহা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি ঘটে নাই। যথা, কোনও রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণের নির্দ্ধারিত তিনটি রাত্রির প্রথম রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ লাগিবে এবং সূর্য-গ্রহণের নির্ধারিত দিনগুলির দ্বিতীয় দিনে সূর্য গ্রহণ লাগিবে। বয়হকী ও অন্যান্য হাদিছ সংকলন কারীদের পক্ষ হইতেও এই একই ধরণের বিবরণ পাওয়া যায়। 'হাসরিয়ার' গ্রন্থাকার এমন মন্তব্যও করিয়াছেন যে রমযান মাসে এই গ্রহণের ঘটনাদ্বয়ের পরই মাহদী মক্কায় গৃহীত হইবেন। এই সমস্ত ধর্মভীরু বর্ণনাকারীদের একজনে এই মন্তব্য করিয়াছেন যে আকাশ হইতে অসংখ্য স্বর্গীয় নিদর্শন প্রদর্শিত হওয়ার পরই মাহদীর আগমান স্বীকৃত হইবে এবং তাঁহার কর্মজীবনের প্রথম ভাগে জনসাধারণ তাহাকে অস্বীকার করিবে এবং তাহার বিরুদ্ধে নাস্তিকতার ফাতুয়া দিবে। পবিত্র রসুল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছিল তৎসমুদয়ই তাহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইবে। কিন্তু অবশেষে পৃথিবীতে তাহার সত্যতার স্বীকৃতিই প্রাধান্য লাভ করিবে এবং প্রশংসা ও শ্রদ্ধা ভারে তাহাকে স্মরণ না করিবে এমন দুইটি লোকও পাওয়া যাইবে না। এই সত্যও মনে রাখা উচিৎ যে, শেষ দিবস সন্নিকট হওয়ার পূর্ব্বাভাস হিসাবে পবিত্র কুরআনেও এই গ্রহণদ্বয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। আপনারা এই পবিত্র আয়াত পড়িয়া থাকিবেন:—

فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر.

"অতঃপর যখন চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে এবং যখন চন্দ্রে গ্রহণ লাগিবে এবং সূর্য্য ও চন্দ্র সই গ্রহণে) একত্রিত হইবে।" ইহা নিশ্চয়ই ধারণা করা উচিৎ নয় যে, যে নিদর্শনের ইঙ্গিত এখানে দেওয়া হইয়াছে ইহা শেষ দিবসের বিভিন্ন ঘটনার অন্যতম কারণ। এই আয়াতে উল্লেখিত গ্রহণদ্বয় ঘটিতে গেলে এই পৃথিবীর অস্তিত্বের প্রয়োজন। এই নিদর্শন সৌ জগতের কতকগুলি নির্দিষ্ট ও সুপরিচিত পরিস্থিতিরই ফলে নির্দ্ধারিত সময়ের ব্যবধানে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘটিয়া থাকে। গ্রহণের ক্ষেত্রে এইরূপ হইয়া থাকে যে গ্রহণ শেষ হওয়ার পরই সূর্য্য ও চন্দ্র ইহাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। পক্ষান্তরে শেষ দিবসের দৃশ্য তখনই প্রকাশ পাইতে পারে যখন সমগ্র বিশ্বের নিয়ম পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ বিপর্যয় ও উলট পালট

সংঘটিত হইবে। পৃথিবী ও ইহার সহচরদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়ার পরই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বর্তমান নিয়ম পদ্ধতির ফলেই সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণ লাগিয়া থাকে এবং বিশ্বের সৃষ্টি অবধি এই গ্রহণও ইহার প্রাকৃতিক নিয়ম ও দৃশ্যের অংশ হইয়া আসিতেছে। কাজেই ইহা অতি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কুরআনে বর্ণিত চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণদ্বয় শেষ দিবসের পূর্বের এক সময়ে ঘটনীয় ব্যাপার; ইহাদের অস্তিত্ব বিলোপের পর এইরূপ গ্রহণ শেষ দিবসের লক্ষণ হইতে পারে না। আমার লিখিত "নূরুল হক" নামক পুস্তকে এই সমস্ত বিষয়াদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। অধিকন্তু এই সমস্ত লক্ষণাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ঐ পুস্তকে আরও কতকগুলি জরুরী বিষয়াদি বর্ণনা করা হইয়াছে। আমার এই যুক্তির ওজন বৃদ্ধি করার জন্য আমি এইগুলি এখানে পুনরায় উল্লেখ করিতে চাই।

আমি ঐ "নূরুল হক" পুস্তকে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি যে গ্রহণের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার পর যাহারা আমার সত্যতায় আস্থা স্থাপন করিতে বিমুখ হইবে এবং দীনকে দুনিয়ার উপর স্থান দিবে না, তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। তদনুযায়ী এইরূপ ঘটিল যে, গ্রহণদ্বয়ের ঘটনার পর এই দেশের সর্তকহীন লোকদের উপর প্লেগরোগ অবতীর্ণ হয় এবং তাহাদের সহস্র সহস্র লোক এই মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এই মহামারী দুস্কৃতি পরায়ণদিগকে অগ্নিসদৃশ ধৃত করে। তাহারা এই রোগের শিকারে পতিত হইয়া শহর ও গ্রাম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে। এই অগ্নিকুণ্ড এখনও তাহাদের শিরোপরে প্রজ্জলিত হইতেছে। এই ঘটনার পূর্বে আমার নিকট অবতীর্ণ উপর্যপরি বহু ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ীই এই সমস্ত ঘটিয়াছে। ইহাতে ধর্ম ভীরুদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। উল্লেখিত পুস্তকে আমি ইহাও বলিয়াছিলাম যে, গ্রহণের নিদর্শন সম্পন্ন হওয়ার পর আল্লাহতায়ালা ধার্ম্মিক লোকদিগকে সাহায্য করিবেন। তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, তাহাদের কাজ কর্ম্মের উন্নতি হইতে থাকিবে এবং আল্লাহতায়ালা আরও নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করিয়া মানব মণ্ডলীর মধ্যে স্বীয় সত্তার সত্যতা সম্পর্কিত তত্বজ্ঞান প্রদান করিবেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহার কৃপা ও অনুগ্রহে এই সমস্ত ভবিষ্যৎদ্বাণী পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বাসীদিগকে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমার শিষ্যমণ্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর উপর ৭০ বৎসর পূর্বে নাযেল কৃত কতিপয় এলহাম ও রো'ইয়া

২৬ শে মে, ১৯০৫ ইং—

"আমার স্ত্রী অসুস্থ ছিলেন। খুব মাথা ব্যথা, জ্বর এবং কাশিও ছিল। মানুষের জন্য পরীক্ষার ভয় ছিল। আমি রাত্রিতে অনেক দোওয়া করি (শেখ রহমতুল্লাহ্‌কে সম্বোধন করিয়া) আপনার জন্যও দোয়া করিয়াছিলাম। প্রথমে এক অনির্দিষ্ট এলহাম হয়—কাহার জন্য বুঝা গেল না। উহা এই:

(۱) شر الذین انعمت علیہم (۲) میں ان کو سزا دوں گا۔ (۳) میں اس عورت کو سزا دوں گا۔

অর্থাৎ—(১) "তাহাদের দুষ্টামী, যাহাদিগকে তুমি পুরস্কার দান করিয়াছিলে।

(২) আমি তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিব।

(৩) আমি সেই স্ত্রীলোককে শাস্তি দিব।"

জানিনা, ভবিষ্যদ্বাণী কাহার সম্বন্ধে।

অতঃপর আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে এলহাম নাযেল হইল:

(۱) رد الیہا روحہا و ریحانہا

(۲) انی رددت الیہا روحہا و ریحانہا

অর্থাৎ—(১) "আল্লাহ্‌তাআলা তাহার প্রতি তাহার আরাম ও সুখের জীবন ফিরাইয়া দিলেন।

(২) আমি তাহার আনন্দ এবং সুখের জীবন ফিরাইয়া দিয়াছি।"

রো'ইয়া—যখন উপরুক্ত ইলাহাম হইল তখন কেহ বলিল যে ইহা আসন্ন ভূমিকম্পের পূর্ব লক্ষণ। যখন আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, তখন দেখিলাম, বাগানে গাড়া আমার এই তাঁবুর মাথা হইতে একটি জিনিস পড়িল। তাঁবুর কাঠের উপরকার বস্তু উহা। যখন আমি উঠাইলাম, তখন দেখিলাম উহা একটি নোলক, যাহা স্ত্রীলোকগণ অলঙ্কার স্বরূপ নাকে পরিয়া থাকে। উহা একটি কাগজে মোড়ক করা ছিল। আমার মনে খেয়াল হইল যে, ইহা আমার গৃহেরই অনেক দিনের হারান জিনিস, এখন উহা ফিরিয়া পাওয়া গেল এবং যমীনের উচ্চতা হইতে পাওয়া গেল এবং ইহাই ভূমিকম্পের পূর্ব লক্ষণ।

(তাযকেরা পৃঃ ৫৫০—৫৫১)।

(৯-এর পাতার পর)

জ্ঞানে ভূষিত হইবে। কিন্তু যে দুষ্টামী ও বিদ্বেষ লইয়া কুরআন পাঠ করিবে, তাহার জন্য জ্ঞানের এই মহাভাণ্ডার খোলা হইবে না।

(৫) উপরে "বিসমিল্লাহ্‌র ফযিলত" শীর্ষক (৩) ও (৪) দফায় তওরাত গ্রন্থের যে দুইটি ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছি, উহাতে রসূলে করীম (সাঃ) সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণীই ছিল যে, তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার সকল বাণী তাঁহার নাম লইয়া বলিবেন। উহার পূর্ণতার জন্য এবং সেদিকে ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং সারা জগদ্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এখানে ইসম অর্থাৎ নাম শব্দের প্রয়োগ জরুরী ছিল এবং তাহাই করা হইয়াছে। (ক্রমশ:)

জুমার খোৎবা

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

[৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ইং তারিখে লণ্ডনে ফজল মসজিদে প্রদত্ত]

আমাদের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা সমস্ত মানবজাতিকে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পতাকার নীচে সমবেত করার ফয়সালা করিয়াছেন।

হুজুর (আইঃ) তাশাহুদ, তায়াউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর সুরা হামমীম সিজদার এই আয়াত পাঠ করেন :

ومن احسن قولا ممن دعا الى الله
وعمل صالحا وقال اننى من المسلمين
(آية ٣٤)

এই আয়াতের তফসীর বর্ণনা করিয়া হুজুর বলেন : আল্লাহ্তায়ালা এই আয়াতে বলিয়াছেন যে, সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা আর কোন ব্যক্তির কথা উত্তম হইতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বন করিয়াছে এবং স্বীয় ঈমান মোতাবেক আমলে-সালেহ পালন করিয়াছে এবং এই ঘোষণা করিয়াছে, 'আমি মুসলমানগণের অন্তর্ভূক্ত, অর্থাৎ, 'আল্লাহ্তায়ালার প্রদত্ত তওফিক ও অনুগ্রহ ক্রমে আমি তাঁহার অনুগত।' এখানে প্রশ্ন উঠে যে, উল্লিখিত সর্বোত্তম কথা, তথা আল্লাহর দিকে আহ্বান করা—কাহার নিকট উত্তম? সুতরাং এতদ্বারা একে তো স্বয়ং আল্লাহ্তায়ালার সত্তাকে বুঝায়, যিনি কুরআন শরীফ নাযেল করিয়াছেন এবং দ্বিতীয়তঃ এতদ্বারা চক্ষুষ্মান ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে বুঝায়। কেননা احسن (আহ্সান) শব্দ এক তো সেই সৌন্দর্যের জন্য বলা হয়, যাহা আল্লাহ্র সহিত সংশ্লিষ্ট ; দ্বিতীয়তঃ সেই সৌন্দর্যের জন্য বলা হয়, যাহা অন্তর্দৃষ্টির সহিত সম্পর্ক রাখে। তেমনিভাবে, ইমাম রাগিব, (রহঃ) 'মুফ্রদাত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"احسن قولا" (আহ্সানু কওলান) দ্বারা ইহা বুঝায় যে, আল্লাহ্তায়ালা এবং তাঁহার নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নিকট আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করা অপেক্ষা উত্তম কোন কথা নাই।

অতঃপর হুজুর আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত 'কওল'-এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়া বলেন যে, কওল বা কথা বলিতে মুখ নিঃসৃত কথা, ও সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী সম্পাদিত সুকর্ম বুঝায় এবং এই তিনটি বিষয়ই উহার অন্তর্ভূক্ত। কেননা 'কওল' শব্দ কুরআন শরীফে মৌখিক কথা, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আমল বা সুকর্ম—তিনটি বিষয়ের উপরই ব্যবহার হইয়াছে। সেই জন্য প্রকৃত মোমিন শুধু সেই কথাই মুখে উচ্চারণ করে, যাহার উপর তাহার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে এবং আমলও সেই বিশ্বাস অনুযায়ী হইয়া থাকে, এবং এইরূপ মোমিন

ব্যক্তি, অপরে তাহার সম্বন্ধে কি বলে বা না বলে উহার প্রতি কোনই ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, নিজে ইহা বলার হক রাখে যে, انني من المسلمين (আমি মুসলিম, আমি ফর্মাবরদার)। যে কথার সহিত অন্তরের বিশ্বাস নাই এবং তদোনুযায়ী আমলও নাই, উহা তো মুনাফেকের কথা হইয়া থাকে, যাহা কোন অবস্থাতেই সমাদরে যোগ্য নয়। সেই জন্যই আল্লাহ্‌তায়ালা আমল বিহীন কথার অসারতা প্রাকাশার্থে মুনাফেকদের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

واذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به الله و يقولون فى انفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول - (المجادلة : ۱۷ ايت)

অর্থাৎ, "হে রসুল! যখন মুনাফেকগণ তোমার নিকট আসে, তখন তাহারা তোমাকে এমন ভাষায় দোয়া দেয়, যে ভাষায় খোদা-তায়ালা দোয়া দেন নাই, অর্থাৎ দোয়ায় বানয়ট পূর্বক আতিশায়েক্তি করিয়া থাকে। অতঃপর মনে মনে বলে যে, আল্লাহ্‌-তায়ালা আমাদের মুনাফেকী কথার জন্য কেন শাস্তি দেন না?" সেই জন্য কুরআনের পরিভাষায় 'আহ্‌সানু কওলান' (সর্বোত্তম কথা) উহাই হইবে, যাহার মধ্যে সঠিক উক্তি, সহীহ্ আকীদা এবং আমল—তিনটিই শামিল থাকিবে। এই অর্থ ইমাম রাগিব (রহঃ) 'মুফ্রদাত' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, এবং উক্ত অর্থ তিনি কুরআন মজীদের এই আয়াত হইতে নির্ণয় করিয়াছেন :

الذين قالوا اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله و انا اليه راجعون -
(البقرة : ۱۵۷ ايت)

(অর্থাৎ, যখন তাহাদের উপর বিপদ আসে তখন তাহারা বলে যে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চয় তাঁহারই দিকে আমরা প্রত্যাগমন করিব।) এই আয়াত দ্বারা তিনি মৌখিক স্বীকৃতি, আন্তরিক বিশ্বাস এবং আমলে সালেহ্—তিনটিকেই কওলে-আহ্‌সানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সপ্রমাণীত করিয়াছেন।

কওলে আহ্‌সান (সর্বোত্তম কথা)-এর বিশদ ব্যাখ্যাদানের পর হুজুর دعا الى الله (আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান)-এর তফসীর করিতে গিয়া বলেন : কওলে-আহ্‌সান-এর উল্লিখিত অর্থ অনুযায়ী 'দায়া ইলাল্লাহ্'-এর অর্থ হইবে নিজে কথা, বিশ্বাস এবং আমলের দিক দিয়া ত্রিবিধ গুণে গুণান্বিত হইয়া অন্যান্যকে খোদার দিকে আহ্বান করা; অর্থাৎ তাহাদিগকে এ কথার দিকে আহ্বান করা যে, তাহারা যেন সঠিক আকীদা (বিশ্বাস)-এর উপর কায়েম হইয়া আমলে-সালেহ্ (সৎ-কর্ম) সম্পাদন করে এবং এরূপে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি হইতে বাঁচিয়া, তাঁহার প্রেম ও ভালবাসা অর্জন করে। ইহাই সেই 'আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান'; এবং যে ব্যক্তি কথা, বিশ্বাস এবং কর্মের দিক দিয়া নিজে 'ঈমান বিল্লাহ্' (আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসের) গুণে গুণান্বিত হইয়া অন্যদেরও আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করে, সেই ব্যক্তি খোদাতায়ালার নিকট একথা বলার হক রাখে যে, انني من المسلمين (আমি

মুসলমান তথা অনুগত ও আত্মসমর্পনকারীগণের অন্তর্ভূক্ত।)

'আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস' এর উপর নিজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উহার দিকে দা'ওয়াত বা আহ্বান করার গুরুত্ব ও মাহাত্ম বিশ্লেষণ করিবার পর হুজুর আল্লাহ্‌তায়ালার অনন্ত গুণাবলীর মধ্য হইতে কয়েকটি এমন গুণের উল্লেখ করেন, যাহা একমাত্র তাঁহার মহান সত্তার সহিত সংশ্লিষ্ট। এই প্রসঙ্গে হুজুর বলেন: আল্লাহ্‌তায়ালার সত্তা সম্বন্ধে এখন আমি যে কথা বলিতে চাই, তাহা হইল এই যে, তিনি তাঁহার বান্দাগণের দোওয়া শোনেন এবং কবুল করেন। সুরা আল-মোমিনে আল্লাহ্‌ বলেন:

ادعونى استجب لكم (ايت ٦١)

(—আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। ৬১ আয়াত।) তেমনিভাবে সুরা আল- বাকারায় তিনি বলিয়াছেন:

اجيب دعوة الداع اذا دعان -
(ايت ١٨٧)

(যখন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, তখন আমি তাহার দোওয়া কবুল করি। ১৮৭ আয়াত।) কিন্তু দোওয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, যখন দোওয়া উহার যাবতীয় শর্ত সহ করা হয়, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার সার্বিক প্রজ্ঞার সহিত উহাকে কবুল করেন। অর্থাৎ, বান্দা যেভাবে দোওয়া চাহিয়াছে, ঠিক সেই ভাবে উহা কবুল হইবে, ইহা জরুরী নয়; বরং খোদাতায়ালা তাহার দোওয়াকে সেই ভাবে কবুল করেন, যেভাবে প্রার্থনাকারীর পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর হয়। কেননা তিনি জানেন যে, প্রার্থনাকারীর পক্ষে কি ভাল এবং কি ভাল নয়। সুতরাং দোওয়া অবশ্যই কবুল হয়, কিন্তু সেই রূপেই কবুল হয়, যেরূপে খোদাতায়ালার জানা মতে প্রর্থনাকারীর জন্য উত্তম; সেই রূপে নয়, যেরূপে বান্দা তাহার অজ্ঞানতা বশতঃ দোওয়া কবুল হওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করে।

এতদ্ব্যতীত, আল্লাহ্‌তায়ালা সুরা আন-নামালে বলিয়াছেন:

امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء -
(ايت ٦٢)

অর্থাৎ, বল, কোন নিরূপায় উদ্বিগ্ন ব্যক্তি যখন আল্লাহ্‌কে ডাকে, তখন কে তাহার দোওয়া কবুল করেন এবং তাহার দূঃখ-কষ্ট দূর করেন? (৬২ আয়াত)।

يكشف السوء (দূঃখ-কষ্ট দূর করেন)-এর মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা এক আশ্চর্য জনক সুসংবাদ দান করিয়াছেন এবং উহা এই যে, তোমরা দোওয়া করিতে থাক, একদিন নিশ্চয়ই উহা কবুল হইবে। ইহা কখনও সম্ভবপর নয় যে, মানুষ নিরূপায়, উদ্বিগ্ন হইয়া দোওয়া করিলে তাহার সেই দোওয়া কবুল না হয়। নিরূপায় উদ্বিগ্ন (মুয্‌তার) ব্যক্তির দোওয়া

এক না এক দিন নিশ্চয়ই কবুলিয়তের রূপ প্রিগ্রহ করে; অর্থাৎ তাহার দুঃখ-কষ্ট অবশ্যই দূর করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং দোওয়ার ফলে السوء বা দুঃখ-কষ্ট অপসারিত হওয়া মোমিনগণের হৃদয়ের এক স্থায়ী ভরসার বস্তু।

এই প্রসঙ্গে হুজুর আরও বলেন যে, কতক দোওয়া এমন আছে, যাহা এক দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হওয়ার পর পূর্ণ হওয়া নির্ধারিত। উহার জন্য মোমিনগণের জামাতকে বংশ পরম্পরায় দোওয়া অব্যাহত রাখা জরুরী হইয়া থাকে। হুজুর বলেন, এই রূপ দোওয়া গুলির মধ্যে একটি দোওয়া, সমগ্র মানবজাতির এক উম্মতে পরিণত হওয়ার সহিত সম্পর্ক রাখে। সুতরাং তের শত বৎসর ব্যাপী মুসলিম উম্মত এই উদ্দেশ্যে দোওয়া করিয়া আসিয়াছিল। অবশেষে, ঐশী ওয়াদা মোতাবেক প্রতিশ্রুত মসিহ ও মাহ্দীর আবির্ভাবের যুগ আসিল, যাহার মধ্যে উহা পূরা হওয়া নির্ধারিত ছিল। আমি এবং আপনারা সৌভাগ্যবান যে, আমরা মসিহ্ মওউদ (আঃ)-কে সনাক্ত করার এবং গ্রহণ করার তওফিক পাইয়াছি এবং আমরা সমগ্র মানব হৃদয় জয় করিয়া তাহাদিগকে এক উম্মতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে কুরবানী পেশ করার সুযোগ লাভ করিয়াছি। আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন জগতকে আল্লাহ্তায়ালার দিকে দাওয়াত দিতে থাকি এবং এমন হইয়া যাই, যেন, আমরা খোদাতায়ালার সমীপে এই নিবেদন করিতে পারি যে, انني من المسلمين (আমরা মুসলিম, আল্লাহ্র অনুগত ও আজ্ঞানুবর্তী।' আল্লাহ্-তায়ালা আমাদিগকে এই শুভ-সংবাদ দান করিয়াছেন যে, "ইসলাম তোমাদের মাধ্যমেই মানব হৃদয় জয় করিবে এবং জগতে প্রাধান্য বিস্তার করিয়া মানব জাতিকে এক উম্মতে পরিণত করিয়া দেখাইবে।' আর এই পথে যে সকল বাধা-বিঘ্ন ও বিপদাবলী আসিবে, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্তায়ালা কুরআন মজীদে এই ঘোষণা করিয়াছেন যে, তোমাদের দোওয়া কবুল করা হইবে এবং উহার ফলে يكشف السوء 'দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাবলী অপসারিত হওয়ার' দৃশ্যাবলী অবলোকন করিতে থাকিবে। আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন দোওয়া করিয়া চলিয়া যাই এবং 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্' (আল্লাহ্র দিকে আহ্বান) এবং 'ইন্নানি মিনাল মস্লেমিন' অনুযায়ী একথার প্রমাণ পেশ করিতে থাকি যে, আমরা সত্যিকার অর্থে মুসলিম, ফরমাবরদার। তাহা হইলে আল্লাহ্-তায়ালা স্বয়ং তাঁহার ওয়াদা অনুযায়ী আমাদের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাবলী দূর করিতে থাকিবেন। আমাদের দ্বারা মানব মণ্ডলী হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লামের ঝাণ্ডার নীচে সমবেত হইবে। কিন্তু ইহার জন্য আমাদিগকে তওয়াক্কুলের উচ্চ মোকামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কুরবানী পেশ করিতে হইবে এবং দোওয়া করিতে

হইবে। এই জন্যই হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে, "যাহাদের কোমল পা, তাহারা কেন আমার সহিত কষ্ট করে, তাহারা পৃথক হইয়া যাউক।" খোদাতায়ালা তাহাদিগকে স্বয়ং জামাত হইতে কাটিয়া দিবেন। শুধু সে-ই রক্ষা পাইবে, যে মোহাম্মদ (সাঃ-আঃ)-এর আঁচল ধরিয়া থাকিবে এবং তাঁহার প্রতি নাযেল কৃত ঐশী সুসংবাদ ও ওয়াদা সমূহের উপর ঈমান রাখিয়া দুনিয়াতে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রশস্ত চিত্তে কুরবানীসমূহ পেশ করিয়া আল্লাহ্তালার অনন্ত অনুগ্রহ ও পুরস্কারের লক্ষ্য-স্থল হইবে।

অবশেষে হুযুর বলেন, আহ্মদীয়া সেলসেলা প্রতিষ্ঠার আগামী শতাব্দী, যাহা আরম্ভ হইতে পনের বৎসর অবশিষ্ট আছে, ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের শতাব্দী। হুযুর বলেন, এই পনের বৎসর প্রস্তুতি গ্রহণ এবং কুরবানী পেশ করার বৎসর। খোদাতায়ালা আপনাদের উপর বড়ই ফযল ও অনুগ্রহ করিয়াছেন যে তিনি নুতন শতাব্দী আরম্ভ হইবার পূর্বে আপনাদিগকে কুরবানী করার সুযোগ দান করিয়াছেন। এখন আমাদের উপর অনেক বড় দায়িত্ব ভার রহিয়াছে এবং উহা এই যে, আমরা যেন নিজেরা সত্যিকার ঈমান বিল্লাহ্র' গুণে গুণান্বিত হইয়া, শুধু কথায় নহে বরং কার্যতঃ 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্' (আল্লাহ্র দিকে আহ্বান) করিতে থাকি, যাহাতে মানব জাতি 'উম্মতে ওয়াহেদার' রূপ ধারণ করিতে পারে। আল্লাহ্তায়ালা নিজে ইহা ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমার এবং আমার নৈকট্য প্রাপ্তগণের নিকট সবচেয়ে উত্তম, প্রিয় ও শ্রেয় কথা এবং ঘোষণা ইহা যে, মানুষ যেন নিজে বলে— انني من المسلمين

—(ইন্নানীমিনাল মুসলেমীম।) খোদাতায়ালা এ কথাকে উত্তম, প্রিয় ও শ্রেয় ঘোষণা বলিয়া আখ্যা দান করেন নাই যে, কোন ব্যক্তি অন্য কাহারও সম্বন্ধে ইহা বলে যে, সে কি বা কে; বরং প্রিয় ও শ্রেয় কথার ঘোষণা বলিয়া এই কথাই সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, মানুষ যেন নিজে বলে যে, 'আমি আল্লাতায়ালার ফরমা-বরদার, মুসলিম।' অতঃপর তাহার কথা ও কাজ যেন ইহার সাংখ্য প্রদান করে যে, সে সত্যিকার ভাবে আল্লাহ্তায়ালার ফরমাবরদার আজ্ঞানুবর্ত্তী গণের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং দুনিয়া এবং উহার মধ্যস্থ সব কিছুর আশার উর্ধে উঠিয়া মানবজাতিকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পতাকা তলে সমবেত করিবার জন্য কুরবানী সমূহ পেশ করিতে

থাক এবং দোওয়া করিতে থাক এবং শুধু সেই সকল হাতিয়ার কাজে লাগাও, যাহা আল্লাহতায়ালা তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন আমাদিগকে আকাট্য দলিল প্রমাণের হাতিয়ার দেওয়া হইয়াছে, আমা- দিগকে দোওয়ার কবুলিয়তের হাতিয়ার দেওয়া হইয়াছে, আমাদিগকে আসমানী নিদর্শনাবলীর হাতিয়ার প্রদান করা হইয়াছে। এইগুলি অব্যর্থ ও অত্যন্ত কার্যকরী হাতিয়ার এবং ইহাদের দ্বারাই ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য বিস্তার করা নির্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন, কুরবানী করুন এবং দোওয়ার দ্বারা কাজ করিয়া যান, যাহাতে আল্লাহ্তায়ালা মানবজাতিকে হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পতাকার নীচে যথাসম্ভব শীঘ্র একত্রিত করেন। (আল্লাহুম্মা আমীন)

[সাপ্তাকি বদর (কাদিয়ান), ১৩ শে অক্টোবর ১৯৭৫ সংখ্যা]

অনুবাদ :—আহমদ সাদেক মাহমুদ

জরুরী ঘোষণা

১। আগামী ৩০ শে নভেম্বর রবিবার মুয়াল্লেমগণের ইসলামী নীতিদর্শন কিতাবের প্রথম খণ্ডের পরীক্ষা হইবে।

২। আগামী ৭ই ডিসেম্বর জমাতের সাধারণ বন্ধুগণের জন্য পরীক্ষা হইবে। এই পরীক্ষা আমাদের শিক্ষা পুস্তিকার উপার হইবে।

—ওবাইদুর রহমান ভূঞা

সেক্রেটারী তালীম, বাঃ আঃ আঃ, ঢাকা।

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জমায়াতের সামনে দোয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল :

জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ৯৮০ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করুন।

(৩) কমপক্ষেসাতবার সুরা ফাতিহা পাঠ করুন। নিক

(৪) নিম্নলিখিত দোয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিউঁ ওয়া আলি মুহাম্মাদ —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি জামবিউঁ ওয়া আতুব ইলাইহি —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন —দৈনিক কমপক্ষে ৯৯ বার

(ঘ) আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) ইয়া হাফিযু ইয়া আজিজু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহফজনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিঁড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ)।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar